জুমুআর খুতবা (২৫ নভেম্বর, ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৫ নভেম্বর ২০১১-এর (২৫ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আজকাল আফ্রিকা মহাদেশের কোন কোন দেশের গোল্ডেন জুবলী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ সব অনুষ্ঠানাদির মাঝে আমাদের প্যান আফ্রিকান এসোসিয়েশন'ও অংশ গ্রহণ করছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে এ এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছিল, যা আফ্রিকান আহমদী বন্ধুদের সমন্বয়ে গঠিত।

যা হোক, আমি যেমন বলেছি, আমাদের এই এসোসিয়েশনও আফ্রিকান দেশগুলোর আনন্দে শামিল হচ্ছে। তারা এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান করবে, আমাকেও এতে অংশ গ্রহনের আমন্ত্রন জানিয়েছে; আমিও তাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। কিন্তু আজ আমি স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই। দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং ধর্মীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বড় আর্শিবাদ। আফ্রিকা এমন একটি মহাদেশ যার অধিকাংশ দেশ সুদীর্ঘকাল পরাধীন জাতি হিসেবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তাই এসব দেশের স্বাধীনতা দিবসের আনন্দোৎসব এবং জুবলী উদযাপন নিশ্চয় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা তাদের প্রাপ্য অধিকার। আল্লাহ্ করুন আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে যেসব দেশ এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে- এ স্বাধীনতা তাদের জন্য প্রকৃত অর্থেই যেন স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়, এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার আকুতি। পুনরায় যেন দাসত্বের জীবনে তাদের ফিরে যেতে না হয়। বরং এরা যদি সৎ উদ্দেশ্যে, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজেদের স্বাধীনতাকে কাজে লাগায় তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, আফ্রিকা মহাদেশ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। ধর্মের ইতিহাসে দৃষ্টিপাতে আমরা জানতে পারি যে সম্মানিত নবীগণ আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যেসব কাজের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তার মধ্যে একটি অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো স্বাধীনতা। তা সে অত্যাচারী শাসক এবং ফেরাউনদের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অথবা ধর্ম বিকৃত হওয়ার কারণে, অথবা ধর্মের নামে ধর্ম ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে যে সকল কুপ্রথা অথবা ধর্মীয় রীতি-নীতির বা আচার-

অনুষ্ঠানের বেড়ি গলায় পরিয়েছেন- তার দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা প্রদান। এক কথায় সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্মানিত নবীদের সাহায্যে অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটি বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অনেক জাতি এই সত্যকে বুঝেনি এবং স্বাধীনতার প্রকৃত পতাকাবাহীদের অস্বীকার করে, কেবল নিজেরাই প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়নি বরং আল্লাহ্‌র আযাবগ্রস্ত হয়ে ধ্বংশ হয়েছে। তারা সর্বোত্তম শাসকের (আল্লাহ্‌র) শাসনের উপর জাগতিক শাসকদের দাসত্ব করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সেই (খোদার) দাসত্বের উপর একে প্রাধন্য দিয়েছে যে দাসত্ব বরণের ফলে স্বাধীনতার নতুন ধারার সূচনা হয়েছে।

সুতরাং স্বাধীনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার কারণে কেবল স্বাধীনতাই হাতছাড়া হয়নি বরং (মানুষের) ইহ ও পরকালও ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব যদি প্রকৃত স্বাধীনতার মর্মোদ্ধার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আসল স্বাধীনতা সম্মানিত নবীদের মাধ্যমে লাভ হয়। আমাদের সামনে স্বাধীনতার সবচেয়ে উজ্জল সূর্য্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.), যাঁর কিরণ দূর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে, যিনি নিজের মাঝে সকল প্রকার স্বাধীনতাকে ধারণ করে রেখেছেন। যিনি মানুষকে শুধু বাহ্যিক দাসত্ব থেকেই স্বাধীনতা দেননি, বরং বিভিন্ন প্রকার বেড়ি যা মানুষ নিজের ঘাড়ে পরে রেখেছিল তা থেকেও তাদের মুক্ত করেছেন। হুযূর (সা.)-এর সাথে প্রকৃত অর্থে সম্পৃক্ত থাকলে আজও তাঁর সত্বা স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু তাঁকে খাতামান্ নাবীয়ীন উপাধিতে ভূষিত করলেন- তাই তাঁর 'খাতামিয়ত বা খাতামান নবীঈন হওয়া সমস্ত জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে আয়ত্বে এনে তাতে মোহরাঙ্কিত করেছে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই আর আল্লাহ্‌তা'লার সাক্ষ্য প্রদান ও ঘোষণার পর কোন পবিত্রচেতা ব্যক্তির মনে এ সন্দেহই থাকতে পারেনা যে, মুহাম্মদী মোহরই সকল ধরণের উৎকর্ষতাকে সত্যায়িত করতে পারে আর এ সকল উৎকর্ষতার পরম বিকাশ তাঁর স্বত্ত্বাতেই ঘটেছে। প্রত্যেক কাজ এবং বিষয়ের পরম অনুপম রূপ যেহেতু তিনি (সা.), তাই সকল প্রকার স্বাধীনতার পূর্ণ উৎকর্ষতা ও তাঁর স্বত্ত্বা হতে উৎসারিত হওয়ার কথা এবং হয়েছেও। বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্ঠি অবলোকন করেছে যে, এ উৎকর্ষতা বড় মহিমার সাথে তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, আর যারা প্রকৃত পক্ষে এখন পর্যন্ত তাঁর সাথে সম্পৃক্ত তারাও এর পরিপূর্ণতা দেখছে বা দৃশ্য অবলোকন করছে। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গীন গ্রন্থ যা 'খাতামাল কুতুব'ও আখ্যায়িত হয়েছে তাতে স্বাধীনতার বিষয়টিকে বিভিন্ন বরাতে এবং বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অধিকন্তু মহানবী (সা.) এর পবিত্র আদর্শ এ সুন্দর শিক্ষার সৌন্দর্যকে আরো বর্ধণ করেছে। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমের এক স্থানে বলেন, 'ফাক্কু রাক্বাবাহ' (দাস মুক্ত করা) বা এভাবেও বলতে পারেন, দাস মুক্ত করা বা মুক্ত করতে সাহায্য করা। একটি আয়াতের অংশ বিশেষ উপস্থাপন করছি যাতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (সূরা বাকারা ১৭৮) ''আর তারা তাঁরা ভালবাসায় আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থী এবং ঘাড় মুক্ত করা অর্থাৎ দাসদের মুক্ত করার জন্য সম্পদ খরচ করে"।

ইতোপূর্বে যে বিষয় আলোচিত হচ্ছিল সেটিকে সম্মুখে রাখুন তা হলে দেখবেন এটি অনেক বড় পূন্য। আল্লাহ্ তা'লা, পরকাল, ফেরেশতা, ঐশী কিতাব এবং নবীদের উপর বিশ্বাস আনায়নের পর এ পূণ্যগুলোই বান্দাকে খোদার নৈকট্য দান করে, আর সেই সকল পূণ্যের মাঝে দাসদের মুক্ত করাও অর্ন্তভূক্ত। তাই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য, পূণ্যে অগ্রগামী হওয়ার জন্য দাস মুক্ত করা অনেক বড় একটি পূণ্য কর্ম।

হাদীস সমূহেও এ সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত বুখারীর হাদীসে এসেছে- মহানবী (সা.) বলতেন, ''যে মুসলমান দাস মুক্ত করবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দোযখ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করবেন"। ইসলামে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ দাসমুক্ত করার শিক্ষা কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। কোথাও বলেছেন, যদি ভুলবশত: মু'মিন কর্তৃক কোন মু'মিন নিহত হয় তাহলে দাস মুক্ত কর আর রক্তপনও আদায় কর। কেবল মু'মিন হত্যার শাস্তি হিসেবেই দাস মুক্ত করার এ শাস্তি বা আদেশ দেয়া হয়নি বরং বলা হয়েছে, যদি কোন জাতির সাথে তোমাদের চুক্তি থাকে আর সেই জাতির কোন কাফের তোমাদের হাতে নিহত হয়, তাহলে বিনিময়ে একজন দাসকে মুক্ত কর। এছাড়া খোদার নামে কসম ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ যেখানে মানুষের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, যেমন, যদি এটি না হয় তা হলে এ শাস্তি পাবে বা ঐটি না করলে ঐ শাস্তি, এসব শাস্তির মাঝে দাস মুক্ত করাও একটি শাস্তি।

সুতরাং বিভিন্ন জায়গায় দাসমুক্ত করার যে উল্লেখ রয়েছে তার কারণ হলো, ইসলাম ধীরে ধীরে দাস প্রথাকে নির্মূল করতে চায়। দাস গ্রহণের সাধারণ যে প্রথা মহানবী (সা.) এর যুগে বা তাঁর পূর্বে ছিল ইসলাম এসে বিভিন্নভাবে এ প্রথাকে উচ্ছেদের উপর জোর দিয়েছে। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, বরং হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে- হযরত নবী করীম (সা.) মুসলমানদের বলতেন, সূর্য গ্রহণের সময়ে কৃতদাস মুক্ত করো অর্থাৎ যার সামর্থ বা সুযোগ আছে সে যেন এমনটি করে।

দাসদের সম্মান এবং তাদের অধিকারের কথা তিনি (সা.) নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করেছেন- এক পরিবারে সাত ভাই ছিলো আর তাদের কাছে এক পৌত্তলিক কৃতদাস ছিলো। কোন কারণে কৃতদাসের উপর এক ভাইয়ের রাগ ধরে, রাগের বশবর্তি হয়ে সে দাসকে সজোরে থাপ্পড় মারে বা চপেটাঘাত করে। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর কানে যখন এই কথা আসে তিনি (সা.) বললেন এই দাসকে মুক্ত করে দাও। এই কৃতদাসকে রাখার তোমাদের কোন অধিকার নেই, কেননা তোমরা কৃতদাসের প্রতি উত্তম আচরণ করতে জান না।

বস্তুত: আমরা যদি সেই যুগে ফিরে যাই যখন কৃতদাস রাখা একটি সাধারণ নিয়ম ছিলো আর যারা সমাজের প্রধান ছিল তাদের জন্য এটি অনেক বড় সম্পদ গণ্য হতো। সে সময় যার কাছে যত বেশি দাস থাকতো তাকে ততোটা সম্পদশালী বলে মনে করা হতো। প্রভাবশালীরাই কৃতদাস রাখতো। সেই সময় এই আদেশ দেয়া হয় যে, যদি প্রকৃত সম্পদ চাও যা ঈমানের সম্পদ, তাহলে কৃতদাসদের মুক্ত করো। তাদের মুক্তির

সুযোগ সৃষ্টি কর। আর এই আদেশের কারণে সাধ্যানুসারে কয়েক ডজন থেকে কয়েক হাজার কৃতদাসদের তাঁরা মুক্তি দিয়েছেন।

হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) সম্পর্কে বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি এক সুযোগেই বিশ হাজার কৃতদাসকে মুক্ত করে দেন। এছাড়া অন্য সময়েও তিনি আরো বেশ কয়েক হাজার কৃতদাসকে মুক্ত করেছেন। অনেকেই কয়েক ডজন করে মুক্ত করেছেন অর্থাৎ যার যতটুকু সুযোগ হয়েছে তা কাজে লাগিয়েছেন। যাদের কাছে কাজ-কর্মের জন্য কৃতদাস ছিলো তাদের জন্যও ইসলামের এই শিক্ষাই ছিলো যে, তাদের সাথে নিজ ভাইয়ের ন্যায় আচরণ করো। যা নিজে পরিধান করবে তাদেরও তা পরিধান করাও, নিজে যা খাও তাদেরও তা-ই খেতে দাও।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ হলো, বিবাহের পর যখন হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (রা.) সমস্ত কৃতদাস ও সম্পদ তাঁর (সা.)- এর হাতে ন্যস্ত করেন তিনি (সা.) সবাইকে মুক্ত করে দেন। তাদের মধ্যে থেকে যায়েদ বিন হারেস নামে এক দাস ছিলো যাকে তিনি (সা.) পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন আর তার সাথে এমন স্নেহ এবং ভালোবাসার ব্যবহার করতেন যে, যখন তার প্রকৃত পিতা-মাতা তাকে নিতে আসে, হযরত যায়েদ (রা.) তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

অতএব, এ হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম ব্যবহার। এই হলো উত্তম আদর্শ ও অনুগ্রহের পরম বহিঃপ্রকাশ যার মাধ্যমে স্বাধীনতার উপর দাসত্বকে প্রাধান্য দেয়া হলো। যে কারণে তাঁর ভালবাসার মোকাবালায় রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা তুচ্ছ প্রমাণিত হলো।

অতএব, ইসলাম এবং হযরত রসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের কেউ দাস বা মানবতার মুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) অবদানের সমতূল্য এরূপ একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে পারবে? তিনি (সা.) তাঁর নিজের অনুসারীদেরকে বলেছেন, দাসদের দিয়ে কাজ করানোর সময় তাদের সাথে স্নেহসূলভ আচরণ করো। আর যদি কোন কঠোর পরিশ্রমের কাজ হয় তাহলে সে কাজে তাদের সাহায্য কর। আর এভাবে তিনি (সা.) দাস প্রথার ধারনা বদলে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে এক ইতালিয় ধর্মজাযক ডাক্তার ওয়েগলেরী লিখেন, যখন থেকে মানব সমাজের উন্মেষ ঘটেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত মানব সমাজের এর (দাস প্রথার) প্রচলন রয়েছে। একজন মুসলমান যাযাবর হোক বা সভ্য তার কাছে কৃতদাসের অবস্থান অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত। আমেরিকায় আজ থেকে একশ বছর পূর্বে বিরাজমান দাসপ্রথার সাথে প্রাচের দেশসমূহের দাস প্রথার তুলনা করা অন্যায় হবে। মহানবী (সা.)-এর হাদীসে দাসদের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখা যায়। তিনি (সা.) এ কথা বলতেন, ‘‘এটি কখনো বলো না যে, সে আমার দাস বরং বলো সে আমার ছেলে। আর এটি বলো না যে সে আমার দাসী বরং বলো সে আমার কন্যা’’। তিনি আরও লেখেন যে, যদি ইতিহাসের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, হযরত রসূল (সা.) এই বিষয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেছেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এক স্বাধীন ব্যক্তির ঋণ নিয়ে ঋণ শোধে অপারগতার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত। কোন ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহন করে ফেরত না দেয়া পর্যন্ত ঋণদাতার দাসত্ব করতে হতো বা এ ধরণের আশঙ্কা থাকতো। তিনি লিখেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে দাস বানাতে পারতো না। খোদার নবী (সা.) দাস প্রথাকে কেবল সীমিতই করেননি বরং তিনি এ ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন এবং মুসলমানদের বলেছেন তারা যেন সকল কৃতদাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

প্রফেসর ওয়েগলেরী সাহেব ইতালীয় ভাষায় লিখেছেন, এই বই ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং জামাত আহমদীয়া আমেরিকা কোন এক সময় এটি প্রকাশও করেছিল। এতে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে বেশ ভাল বক্তব্য রয়েছে। এটি পুনরায় প্রকাশ করা উচিত। কারো নামে যদি স্বত্ত্ব সংরক্ষিত (কপি রাইটস) না থাকে আর আমেরিকানরা অনুমতি পেয়ে থাকে তাহলে তা পুণরায় প্রকাশ করা উচিত। এটি সেই সমস্ত শত্রুদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট যারা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর বিরোধীতা করে।
সুতরাং এটি সেই শিক্ষা ও সেই আদর্শ যার গুরুত্ব স্বীকার না করে তিনি পারেননি। এটি সেই মহান শিক্ষা ও আদর্শ যা মানুষের মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব ও অর্থ বহন করে। আমি এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরেছি। কুরআন ও হাদীসে আমরা এ ব্যপারে অগনিত আদেশ নিষেধ ও দিক নির্দেশনা দেখতে পাই। আর এটিই সেই মৌলিক শিক্ষা যা পালন করে পৃথিবীবাসী মুক্তি পেতে পারে, আর শান্তি, ন্যায়বিচার ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আফ্রিকায় যারা স্বাধীনতা পেয়েছেন অর্থাৎ সেখানে যারা আহমদী হয়েছেন তাদের কাজ হলো, এই শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়া এবং অধিক থেকে অধিকতর জনগোষ্ঠীকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের গন্ডির্ভূক্ত করা যেন তারা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে। শুধু একবার গোল্ডেন জুবিলী উদ্‌যাপন করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং স্বাধীনতা তখন প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শাসকরা এবং জনসাধারণ উভয়ে এটি বুঝবে যে, আমাদের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায় আর এর জন্য কী পথ বা পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। সেই পথ বা পদ্ধতি কেবল মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও কুরআনী শিক্ষার মাঝেই পাওয়া যাবে। ওয়েগলেরী সাহেব তো কেবল এতটুকু লিখেছেন যে, কোন মুসলমানকে দাসত্বের গন্ডিভূক্ত করা যাবে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে কখনও কেউ দাস হতে পারে না। এ কথাটিও একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সবর্দা স্মরণ রাখা উচিত, মহানবী (সা.) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে উম্মতকে যে অন্তিম উপদেশ দিয়েছিলেন তা ছিল, ‘‘নামায এবং দাস সম্পর্কীত আমার শিক্ষাকে তোমরা ভুলবে না”। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান বিশেষভাবে সম্পদশালী ও ক্ষমতাসীনদের এটি দূর্ভাগ্য যে তারা এই দু’টি শিক্ষাকেই ভুলে গেছে। তাদের নামাযেও সেই স্বাদ ও উৎসাহ উদ্দীপনা এবং খোদাভীতি দেখা যায় না এবং দাস প্রথা দূরীভুত করার কোন প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। যদিও দাস কেনা বেচার সেই চিত্র এখন বিদ্যমান নেই, কিন্তু ক্ষমতার নামে জনসাধারণের সাথে দাসের ন্যায় আচরণ করা হয়। কিছু দেশে বিশেষভাবে আরব দেশসমূহে যে অস্থিরতা ও শোরগোল

দেখা যায় এর প্রধান কারণ হলো, জনগণের মাঝে এই বোধোদয় হয়েছে, আমাদের সাথে দাসের ন্যায় আচরন করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের নামে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু যিনি রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত হন তিনি আজীবন ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখতে চান এবং চান যে তার পর তার সন্তানরাই ক্ষমতা ভোগ করুক। তোশামদকারী ও সুবিধাবাদীরা এসকল রাষ্ট্রপ্রধানদের আশে পাশে একত্র হয়ে তাদের ভালমন্দের পার্থক্য-শক্তি ও মূল্যবোধ একেবারে পাল্টে দিয়েছে। তার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার সকল সম্ভাব্য চেষ্টা তারা করে থাকে। নিজেদের প্রজাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। অত:পর জনসাধারনের পক্ষ থেকে দেশের শাসকের নির্যাতন থেকে মুক্তির নামে যে সকল নৈরাজ্য মাথা চাড়া দেয়, ইসলামের শত্রু-শক্তি বা পরাশক্তি অথবা সুযোগ সন্ধানী শক্তি স্বীয় স্বার্থ্যে দেশের ধন-সম্পদ করায়ত্ব করার মানসে আরো উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নেয়। সাহায্যের নামে আসে এবং এরপর এরূপ এক দুষ্ট বলয়ের সূচনা হয় যা দেশের উন্নয়নকে শত বছর পশ্চাতে নিয়ে যায়। জনসাধারনের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে। তারা স্বজাতির দাসত্ব থেকে বেরিয়ে বিদেশীদের দাসত্বে চলে যায়। যদি সরাসরি নাও হয় পরোক্ষভাবে তা হয়। আমি প্রথমেও বলেছি কতিপয় শক্তিশালী সরকার যে সকল সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা করে তাদেরকে বছরের পর বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখে এবং জনসাধারনের স্বাধীনতা হরনের কোন তোয়াক্কা করে না; যখন তাদের স্বার্থ চরিতার্থ হয় না তখন তারা জনসাধারনের স্বাধীনতার নামে দেশে অভ্যূত্থান ঘটায়। তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমান চিত্র হলো কতিপয় দেশে অতি সম্প্রতি শাসক পরিবর্তিত হয়ে নতুন শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরকে দেখে এই পরাশক্তিরা দু:শ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে যে, আমাদের পছন্দসই শাসক ক্ষমতায় সমাসীন হয়নি। কতিপয় স্থানে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক পরিবর্তন আসেনি বা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন আসবে না। তাই এ বিষয়গুলো তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে আর একটি বিশৃঙ্খলা ও কপটতার ধারা সূচিত হতে যাচ্ছে, বরং অনেক স্থানে আরম্ভ হয়ে গেছে। জনসাধারণও ভুল ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত এক শাসকের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্য শাসকের পরাধীনতায় নিমজ্জিত হচ্ছে, আর কোন কোন স্থানে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এখন তারা এটা অনুভব করতে পেরেছে যে, দেশের সম্পদ এখনো জনসাধারণের স্বার্থে, তাদের কল্যাণের জন্য, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে আর না ভবিষ্যতে করা হবে। কেননা যে শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে তারাও নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার ধ্যান ধারণা নিয়ে ক্ষমতা দখল করছে। দারিদ্র ও বঞ্চিত জনসাধারণ পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভবিষ্যতে তা দূর হবে বলে যে আত্মপ্রসাদ নেয়া হচ্ছে তা ঠিক নয়, তা দূরীভূত হবে না বরং অবশ্যই বিরাজমান থাকবে। এরূপ অবস্থা কিছুদিন পরে আপনারা স্বয়ং দেখতে পাবেন। কেননা শাসকরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলেনি। মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু তাঁর নির্দেশ মান্যকারী নয়। অতীতে ধন-সম্পদের বলে মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করত; এখন দেশের সম্পদ দেশের জনসাধারণকেই দাসে পরিণত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন প্রচার মাধ্যমও এসম্পর্কে মুখ খোলা আরম্ভ করেছে, ছবিও প্রকাশিত হচ্ছে যে, তেল সমৃদ্ধ দেশসমূহেও

দরিদ্রতা ছেয়ে আছে। একদিকে স্বর্ণের রাজপ্রাসাদ অপরদিকে কোন কোন পরিবারের দুই বেলা পেট ভরে খাবার জোটে না।

সুতরাং অধিকার খর্ব করে জনসাধারণকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা হচ্ছে এবং হয়েছে। কোথায় সেই যুগ, যখন হযরত ওমর (রা.)-কে শত্রুদের শক্তি অর্জনের কারণে নিজের সৈন্য বাহিনীকে খৃষ্টান অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য সেই অঞ্চল সমূহে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু মুসলমানগণ খৃষ্টানদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে টাকা কর হিসেবে নিয়ে ছিল তা এই বলে ফেরত দেয় যে এখন যেহেতু আমরা তোমাদের অধিকার প্রদানে অপারগ তাই তোমাদের নিকট থেকে যে অর্থ নিয়েছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি। সেই সময়কার খৃষ্টান প্রজার কেঁদে কেঁদে এই দোয়া করে যে, আমরা দোয়া করি তোমরা ফিরে আস। কেননা আমরা তোমাদের মত শাসক দেখিনি। মুসলমানদের শাসনের অধীনে আমরা যে ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি তা আমরা আমাদের শাসকদের নিকট থেকেও পাইনি। কোথায় সে যুগ! আর এ যুগে, মুসলমান শাসকগণ মুসলমানদের সম্পদ লুন্ঠন করছে এবং দেশে ন্যায়পরায়নতা নি:শ্বেষ হয়ে গেছে, অধিকার হরণ করা হচ্ছে। কারো ধন ও প্রাণ নিরাপদ নয়। অথচ ধৃষ্টতার সাথে এ দাবী করা হয় যে, জনসাধারণের জন্য তারা যা করছে তা আর কেউ করতে পারবে না। বিভিন্ন দেশে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, সূযোগ সন্ধানীরা তা লুফে নিচ্ছে। অনেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করে চলেছে। এমনটি কখনো হতো না যদি জনগনকে তাদের অধিকার প্রদান করা হতো। যদি সরকার ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো জনগণের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিত সরকার যদি লোভ-লালসার পরিবর্তে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করতো তবে কখনো এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না। যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি অর্থাৎ ধর্মীয় আলেমরা জনগনের ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে ধর্মের মাঝে বিদাত বা ভুল পদ্ধতি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের ঘাড়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। ঐসব ভ্রান্ত রীতি-নীতি এবং ভুল শিক্ষা তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছে। মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে আগমনকারী মহান নবী (সা.) সর্ম্পকে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم (সূরা আরাফ ১৫৮) অর্থাৎ আমাদের নবী তাদের বোঝা হালকা করে থাকেন এবং যে বেড়ি তাদের ঘাড়ে রয়েছে তা অপসারণ করেন। কিন্তু এখানে আজকাল কী হচ্ছে? আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ অর্থাৎ অমুসলিম দেশ সমূহে জনগনের অধিকার, ন্যায় পরায়নতা এবং জনগনের স্বাধীনতা ও উন্নতি অবলোকন করে তাদের আদর্শ অনুকরণ করা উচিত ছিল সেখানে এদের অবস্থা এক্ষেত্রে একেবারেই এর বিপরীত। ঐ সব আলেম ওলামাদের উচিত ছিল প্রকৃত ইসলামের প্রসার করে সকল প্রকার বেদাত থেকে মুসলমানদেরকে পবিত্র করা অথচ তারাও তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে রেখেছে। উভয়েই সাধারন মুসলিম জনগনকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাই কেবল শাসকরাই দোষী নয় বরং এ সময়ের ওলামারাও তাদের দলের অন্তর্ভূক্ত যারা মিথ্যা রীতি-নীতি এবং মিথ্যা বিশ্বাস সমূহকে ধর্মের নাম দিয়ে জনসাধারণের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ছলে

তাদেরকে এক অর্থে কৃতদাস বানিয়ে রেখেছে। আর এ ধারা অব্যাহত থাকবে, কখনো শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা খোদা তা'লার প্রেরিত সেই ব্যক্তিকে মান্য না করবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং আমাদেরকে সকল ধরনের বোঝা ও সকল প্রকারের বেড়ি থেকে পরিত্রাণ দেয়ার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন। আর কেবল একটি দাসত্ব বরণের তিনি শিক্ষা দিয়েছেন তা হল খোদা তা'লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর দাসত্ব যার মাধ্যমে স্বাধীনতার নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়, সাম্য পরিলক্ষিত হয়, এমন এক চমৎকার সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে যেখানে অধিকার পাবার জন্য মিছিল করা হয় না, স্বাধীনতা লাভের জন্য অন্যায় পন্থা অবলম্বন করতে হয় না বরং অধিকার প্রদানের জন্য বাদশাহ এবং ফকির উভয়েই সচেষ্ট থাকে। অতএব এখন মুসলমানদের সম্মান রক্ষা এবং সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা থেকে পরিত্রাণের একটিই মাধ্যম, আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর আদেশাবলী এবং শিক্ষাসমূহ মেনে চলা। আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐ ব্যক্তির অস্বীকার করা থেকে বিরত না হবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা উভয় প্রকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রেরণ করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি চমৎকারভাবে আমাদের সামনে সেই শিক্ষাকে উপস্থাপন করেছেন যা সত্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত রাখে, যা স্থায়ী স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। তিনি (আ.) বলেনঃ''স্মরণ রেখো, একজন মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং বান্দার অধিকারসমূহ প্রদানের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত থাকা উচিত। মৌখিকভাবে যেমন খোদা তা'লাকে তার স্বত্ত্বা এবং বৈশিষ্ট্যে এক অদ্বিতীয় মনে করা হয় ঠিক সেভাবেই কার্যে পরিণত করে তা দেখানো উচিত এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা উচিত"। তিনি (আ.) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বচ্ছ না হবে ততদিন পর্যন্ত খোদা তা'লার সাথেও সম্পর্ক স্বচ্ছ হতে পারে না। যদিও এ দু ধরনের অধিকারের মধ্যে বড় অধিকার খোদা তা'লার কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক এর জন্য আয়না-স্বরুপ। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে লেনদেনে স্বচ্ছ নয় সে খোদা তা'লার অধিকারও আদায় করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে কাউকে ভাই মনে করা। যে নিজেকে বড় মনে করে, অন্যদের তুচ্ছ মনে করে এবং তুচ্ছ প্রমাণের চেষ্টাও করতে থাকে, তার কাছ থেকে কখনো সুবিচার এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের আশা করা যেতে পারে না। যাই হোক তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যে জামাত গঠন করেছিলেন তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই পূত, পবিত্র এবং প্রত্যেকে স্বীয় জীবনকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলো। তাদের মধ্যে থেকে একজনও কপটতামূলক জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না। সকলেই আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার প্রদানকারী ছিল।

সুতরাং যখন ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়া হবে তখন সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে যা বান্দাকে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী বানাবে এবং সৃষ্টির অধিকার আদায় করার ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি করবে। মুসলমানদের মাঝে, মুসলমান বিশ্বে আজকে আমাদের একজন নেতাও এমন চোখে পড়ে না যিনি এই মানে অধিষ্ঠিত। আর যখন প্রকৃত ন্যায় বিচার এবং অধিকার প্রদানকারী নেই সেখানে প্রত্যেকেই নিজ অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য নিজের পদ্ধতি অবলম্বন করে। যেভাবে আমি বলেছি, এতে স্বার্থান্বেসীরা পুনরায় স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করে। অত:পর ন্যায় বিচার এবং স্বাধীনতার

নামে অত্যাচারের ও নিস্পেষনের এক নতুন উপাখ্যান ও নুতন কাহিনী আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমান স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে এক দাসত্ব থেকে বেড়িয়ে অন্য দাসত্বের গন্ডিতে প্রবেশের নাম। আফ্রিকার বেশীরভাগ দেশগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন অথবা অন্যান্য মুসলমান দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে এ দৃশ্যই দেখা যায়। অন্যদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও স্বজাতির নেতাদের চাপানো দাসত্ব তাদের পরিবেষ্টন করল।

মুসলমান দেশের নেতৃবর্গ, আফ্রিকান দেশের নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সেনা বাহিনী যারা প্রায়শই বিপ্লবের নামে ক্ষমতা করায়ত্ব করতে থাকে, ধর্মীয় নেত্রীবর্গ যারা ওলামা আখ্যায়িত হয় তারা সকলে যেন এ সত্যকে অনুধাবন করতে পারে যে, স্বজাতিকে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করলে, সুবিচার না করলে এবং অন্যান্যদের অধিকারসমূহ প্রদান না করে তারা আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধরা পড়বে। প্রত্যেক শাসককে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি তোমাদের প্রজাদের অধিকার দিয়েছ? যা তোমাদের দায়িত্ব ছিল তা কি তোমরা পালন করেছে না কি দেশীয় সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করেছ? ইসলাম এবং আল্লাহ্ রসূলের নাম তো নিয়েছো কিন্তু এই নামের প্রতি কি শ্রদ্ধাশীল ছিলে? না বোধক উত্তরের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধরা পড়বে কেননা খোদা তা'লার সামনে তো মিথ্যা বলা যেতে পারে না। খোদা তা'লার কাছে কোন বিষয় গোপন করা যায় না। আল্লাহ্ তা'লা কুরাআন করীমে বলেন,

অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন তারা যারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান। সুতরাং নেত্রীবর্গ তাদের উপর অর্পিত আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। কেননা তারা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষী রেখে অঙ্গিকার করেন। তারা এ অঙ্গীকার করেন যে, তারা দেশের কল্যাণ এবং সর্ব-সাধারনের কল্যাণ, তাদের অধিকার প্রদান, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার জন্য সকল সম্ভাব্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু এটি চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ স্থানে জাতীয় সম্পদ লুটপাটের দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই।

আলেমগন ধর্মকে জীবিকার উৎস হিসেবে নিয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি জনসাধারনকে ভ্রান্ত প্রথা-প্রচলন, ভ্রান্ত শিক্ষা বিশ্বাসের বেড়ি পরিয়ে শুধু নিজেদের অনুগত রাখার চেষ্টা করা হয়। জনসাধারনও স্বীয় দায়িত্বে অবহেলা করছে। মোটকথা ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন না করে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে যেসব বিশৃঙ্খলা হচ্ছে তা এ বিষয়েরই আবশ্যকীয় ফলাফল। সন্ত্রাস, আর্থনৈতিক দুরবস্থা, অশান্তি ইত্যাদি শুধু বর্তমানের নয় বরং এক চরম অস্থির ভবিষ্যতের আভাষ দিচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ, পাকিস্তানেই স্বাধীনতার পর বাষট্টি-তেষট্টি বছরে এ বিষয়গুলো চরম রূপ ধারণ করেছে এবং প্রতিদিনই তা বেড়ে চলেছে। কেউ বলতে পারে না কাল কি হবে। তাই আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে ভবিষ্যত খুব ভাল হবে। ইংরেজদের দাসত্ব থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু স্বজনের দাসত্বের গলাবন্ধনী বা বেড়ি আরো শক্ত ভাবে চেপে বসেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দেশ ও জনগনের প্রতি করুণা করুন। যে পাকিস্তান অর্জনের সময় কায়েদে আযম ঘোষনা করেছিলেন, এখানে সব

ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সবাই সমান অধিকার পাবে সেখানে আহমদীদের সাথে কি আচরন করা হচ্ছে? প্রত্যেক আহমদী যেখানে সকল স্বাধীনতার উপর খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাসত্বে থাকাকে প্রাধান্য দেয় এবং এজন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেনা, সেখানে আহমদীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়, আমরা তার (সা.) অবমাননাকারী (নাউযুবিল্লাহ্)। নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াকে আমরা কোন গুরুত্ব দেই না, বরং তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমাদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলেও আমরা তা সহ্য করে নেব এবং সহ্য করেও যাচ্ছি। কিন্তু এসব নামধারী আলেম ও শাসকদের ইচ্ছানুযায়ী আমরা কক্ষনো নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না।

পাকিস্তানে আহমদীগণই কেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না ? তারা বলে যে, তোমরা (আহমদীরা) তখনই তোমাদের প্রাপ্য অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে যখন ঘোষণা দেবে,'' আমরা মুসলমান নই এবং আমরা মহানবী(সা.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নই''। খোদার কসম! সব আহমদী টুকরো টুকরো হওয়া পছন্দ করতে পারে, কিন্তু এমন স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকারের উপর তারা থুথুও ফেলে না যা আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এমন স্বাধীনতা তোমরা দুনিয়ার কীটরা উপভোগ কর। আমরা এমন স্বাধীনতার উপর সেই দাসত্বকে প্রাদান্য দেই যা আমাদেরকে মহানবী (সা.) এর জুতার ধূলি বানিয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত দাসত্বের গন্ডিভূক্ত করবে। যারা আল্লাহ্র অধিকার আদায়ের মর্ম বুঝে তা আদায় করে এবং বান্দার অধিকার আদায়ের মর্ম বুঝে তা আদায় করে। ইনশাআল্লাহ সেই দিন আসবে যখন আমাদের এ বিনয় ও দাসত্ব পৃথিবীবাসীকে সত্যিকার স্বাধীনতার দৃশ্য দেখাবে। যারা স্বাধীন হওয়ার আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে তারা প্রকৃতপক্ষে দাসত্বের শৃংখলে বাঁধা। যারা বোঝা তলে চাপা পড়ছে এবং গলার বেড়ির বোঝায় জর্জরিত একদিন এরা বা এদের বংশধরগণ মসীহ্ মুহাম্মদীর দাসত্ব বরণ করে গর্ব অনুভব করবে। এর মাধ্যমে তারা সেই সত্যিকার স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারবে যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এসেছিলেন।

আল্লাহ্ করুন, পৃথিবীবাসী যেন এ স্বাধীনতার দিন শীঘ্রই দেখতে পায় এবং সেই সকল ভয়াবহ পরিনতি থেকে যেন রক্ষা পায় যা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতদের অস্বীকারের ফলে সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল আহমদিকে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে কষ্টের দিনগুলো দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন ।